ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 02. No. 01. August 2009

ইসলাম ও গণতন্ত্রঃ একটি ঐতিহাসিক বিশেণ্ডষণ

মোঃ মিজানুর রহমান*

সারসংক্ষেপ ঃ

সময়ের পরিবর্তনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মনোভাবের বহি:প্রকাশে গণতন্ত্র,প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র এসব তন্ত্র সন্মন্ধে বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে স্ব-স্ব দেশের সিস্টেমকেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ট নিদর্শন বলে প্রচার করার চেষ্টা চলছে এবং এসব তন্ত্রগত ভাবধারা অন্যের উপর ভর করে দেওয়ার অবিরত প্রয়াস চলছে। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলাম এমনই এক কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা কতখানী তার তথ্য ও সত্য উদঘাটিত হয়েছে সময়ের পরিবর্তনে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক লেখনীতে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে চুড়ান্ত ব্যবস্থা ইসলামের ধর্মীয় চেতনায় বিধৃত তার নিখুঁত ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশেণ্ডষণ এই লেখনীর আকর্ষণীয় বিষয়। রাজনৈতিক ও নৈরাজ্যের দিনে বিভিন্ন ইজমের যাতাকলে মানবতার নিপীড়নের এই দুর্দিনে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে, বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার মূল্যায়নে, ঘুমন্ত রাজনৈতিক চেতনাবোধে সাড়া জাগাতে ও মনুষ্য মুক্তির সম্পদ হিসেবে লেখনীটি অতীব মূল্যাবান ও সহায়ক।

ইসলাম পূর্বকালের ঘটনা। পৃথিবী ছিল স্বৈরতন্ত্র এবং গোলামীর নির্মম পেষণে জর্জরিত। দাসত্বের শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা ছিল এই দুনিয়া। খোদায়ী আসনের দাবীদার হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিল রাজা-বাদশাহ্, নগরীর আমীর-উমরাহ্ এবং গোত্র প্রধানরা। অধিনস্ত শাসিতরা ছিল একদম স্বাধীনতাহীন ব্যবহারের পাত্র সদৃশ। এসব শক্তিমান প্রভুদের ইচ্ছার তাবেদারী এবং ফরমাবরদারীই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাসকদের চোখের পলকের একটি মাত্র ইংগিতে যেখানে ভাগ্যের চুড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যেত।

মসীহের সতের শ' বছর আগে দুনিয়াতে যে সব রাজা বাদশাহ্ শাসন করতো তাদের গন্য করা হত সব পবিত্রতার মালিকরূপে, মানবীয় প্রকৃতির উর্ধ্বে, সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে। কেননা তারাই ছিল আলণ্ডাহ্, আলণ্ডাহ্র প্রতিভূ, অন্তত:পক্ষে স্বাভাবিক মানুষ থেকে উচ্চতর কোন কিছু। শক্তিমান শাসকদের খোদায়ী শক্তির দাবী এবং তাদের কার্যকলাপে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে যা তাদেরকে উচ্চতর কোন শক্তির অধিকারী হিসাবে নিজেদের তুলে ধরার চেষ্টায় ব্রত রেখেছিল।

মিশরের ফাঁরাওরা ছিল দেবতা। মসীহের আগমনের সতের শ' বছর আগে এ জন্যই মিশরের জনৈক ফাঁরাও দাবী করেছিল-
"মুসার আলণ্ডাহ্ আবার কে? আমিই হচ্ছি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভূ।"[১]

* এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] আল-কুরআন, সূরা: নাযি'আত, আয়াত:২৪।

ক্যালডিয়ানদের রাজ্যে বাবেলের বাদশাহ্ নমরুদের পূজার জন্য মন্দির তৈরী হতো। ভারতীয়দের রাজারা ভগবানের অবতার দেবতারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতো, রোমের পোপেরা আলণ্ডাহ্র পুত্রের স্থলবর্তী ছিল। তাদের পবিত্র আস্থানায় রাজা-বাদশাহদের মস্তক পর্যন্ত ভূলণ্ঠিত হতো। রোমের 'কায়সর' এবং! পারস্যের 'কিসরা' যদিও ঠিক দেবতা ছিল না, তবুও তারা সাধারাণ মানুষ থেকে উচ্চতর কোন জীব বিশেষ বলে গণ্য হতো। তাদের সম্মুখে বসা নিষিদ্ধ, জিজ্ঞাসার পূর্বে বাকস্ফুতি অপরাধ, তাদের নাম মুখে উচ্চারণ বে-আদবী, এবং তাদের সম্পর্কে সামান্যতম ইতরাজ আপত্তিরও সাজা ছিল নির্ঘাত মৃত্যুদন্ড। রাজকোষ, রাজ্যের ধনসম্পদ এবং পূজাপৃঞ্জ সবই শাহী দরবারের ভোগ সেবাই নিয়োজিত ছিল।[২]

আরব বহির্ভূত দেশগুলো ছাড়াও মূল আরবের অভ্যন্তরেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল। আরবের চারপার্শ্বে ইয়েমেন, ইয়ামামা, গাস্সান, হিরা, বাহরাইন এবং আম্মান এগুলো আগাগোড়া রোম ও মিশরের ধাঁচে গড়া ছিল। ইসলাম আগমনের পূর্বে এ এলাকার সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল ও বিশৃংখলাপূর্ণ। গোত্রদ্বন্ধ, পারস্পারিক যুদ্ধবিগ্রহ, কাটাকাটি, ও হানাহানি, সমগ্র দেশকে একটি রণক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। শান্তি এবং নিরাপত্তার অভাব ছিল দেশের সর্বত্র। এছাড়া এখানে মানুষ দাস এবং প্রভূ অথবা শাসক শাসিত এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা, নেতা বিশেষত বিদেশী শাসকদের করতলগত ছিলো। সকল বোঝা ছিলো দাসদের মাথায়। প্রজা সাধারণ ছিল শাসকদের খেত খামারের মতো যারা ছিল সরকারের অর্থগমের উৎস। শাসকবর্গ সেই অর্থ সম্পদ নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও জুলুম নির্যাতনে ব্যয় করতো, আর জনগণ অন্ধকারে হাত পা ছুড়তো। কোন প্রকার অভিযোগ করার তাদের উপায় ছিল না। সর্বসাধারণকে শাসকদের সব অসম্মান, অবমাননা, অত্যাচার সহ্য করতে হতো।[৩]

স্বৈরতন্ত্র, গোলামী এবং দাসত্বের অপমানে পৃথিবী যখন জর্জরিত তখন লোহিত সাগরের উপকূলে খেজুর বৃক্ষে ঘেরা মরুভূমির দেশে আবির্ভূত হলেন এক "আরব বাদশাহ্" যার অলৌকিক শক্তি ও সামর্থের মূল রহস্য ছিল আধ্যাত্মিক প্রেরণাপূর্ন এক উদাত্ত আহবান। যে আহবানের গুঞ্জরিত সুর ও প্রতিধ্বনি জেগেছিল দুনিয়ার প্রতিটি কেন্দ্রে। সেই উদাত্ত আহবান হলো এই:
"এস আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে যে সাধারণ একটি সত্য রয়েছে তা মেনে নিই অর্থাৎ এক আলণ্ডাহ্ ছাড়া যেন আর কারো ইবাদত না করি, তাঁর ইবাদতে যেন আর কাকেও

[২] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, '*ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র*,' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮১, পৃ.২।

[৩] আলণ্ডামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, '*আর রাহীকুল মাখতুম*', আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯৯, পৃ.৫০।

শরীক না করি, আর আমরা কেউ যেন একমাত্র আলণ্ঢহ্ ছাড়া আর কাকেও প্রভূ বলে স্বীকার না করি।”[৪৪]

এই একটি মাত্র আহবান যার ফলে খোদায়ী দাবীর আসন দখলকারী মানবীয় জুলুম-অত্যাচারের ‘বুৎ’ ধূলায় লুণ্ঠিত হলো। এই অলৌকিক আহবানের শক্তি ‘কায়সর এবং কিসরা’র জুলুম ও জৌলুসে ভরা মসনদ উল্টে দিয়েছিল-র‍্মাতুল কুববার পূজার প্রসাদের বুনিয়াদ উৎপাটিত করে ফেলেছিল। জুলুম, গোলামী, দাসত্বের শৃঙ্খল তাঁর বিনা হাতিয়ারে এবং মানব মুক্তির কার্যকরী পদক্ষেপ ও প্রেরণায় খান খান হয়ে গেল। প্রাচীন দুনিয়ার বুক চিরে ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা, ব্যাক্তির মর্যাদা, বাদশাহ-ভৃত্য, রাজ্যের ধনভান্ডার, সাধারণ সম্পত্তিতে এবং মানুষে মানুষে সমানাধিকার স্বীকৃত হলো এবং স্বৈরতন্ত্রহীন দৃষ্টান্তমূলক এক নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি হলো।

প্রত্যেক নিয়মতান্ত্রিক (আইনানুগ) সরকারের বিশেষ এক নীতি থাকে যাকে ভিত্তি করে সব পরামর্শ ও আইন কানুন রচনা হয়ে থাকে। ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও পালামেন্টারী ব্যবস্থা তার নাম দিয়েছে “শাসনতান্ত্রিক”। সরকার সর্বদা এই মূলনীতি অনুসরণ করে চলতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রে যত আইন-কানুন ও রীতি-নীতি প্রবর্তিত ও প্রচলিত হবে তা সবই সেই মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত হতে হবে।[৫]

ইসলামে যে মূলনীতি রয়েছে, তা হচ্ছে “ কুরআন ও তার বাস্তবায়িত রূপ” যার নাম হল ‘সুন্নাহ্’। ইসলামের সর্ববিধ আইনকানুন এর ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। ইসলামের এই মূলনীতি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মূলনীতির মত মানুষের মনগড়া নয়। এ হচ্ছে সেই সর্ববিধির মূল বিধাতার রচিত মূলনীতি। এ নীতির উপরে স্বভাবতই দুনিয়ার প্রতিটি অনু-পরমানু চলছে। তাঁর বানী ও বিধানের কোনদিন ব্যাতিক্রম দেখতে পাবে না।[৬]

এই মূলনীতির আওতার বাইরে যে সব নিত্যনৈমিত্তিক পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার দেখা দেবে, এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মিলিত পরামর্শের দ্বারা সে সব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাববার বা নতুন করে বলার নেই। স্বয়ং কুরআন এ ব্যাপারে পরিস্কার ঘোষণা দান করেছেঃ অর্থাৎ : রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা কর।[৭] এব্যাপারে নবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

নবী যুগঃ

আযানের পদ্ধতি,হযরত আয়েশা(রাঃ) অপবাদমূলক ঘটনা, বদরের যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া, বদরের কুপের কাছে ছাউনি ফেলা, বদরের যুদ্ধবন্দীদের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে

[৪] আল কুরআন, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৬৪।

[৫] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ আখতার ফার‍্ক, *‘যে সত্যের মৃত্যু নেই’*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ.১৭৬।

[৬] মূলঃ মওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ আখতার ফার‍্ক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬।

[৭] আল কুরআন, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ১৫৯।

মুক্তিদান, ওহুদের যুদ্ধে মদিনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করা, খন্দকের যুদ্ধে শত্র‍্গণের সাথে মদিনার আমদানীর এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপনের প্রশ্ন, হুদায়বিয়ার যুদ্ধ সমস্যা ইত্যাদি।[৮]

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগঃ

কুরআন লিপিবদ্ধকরণ, ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করা, ইরাকের যুদ্ধ, মজুসীদের থেকে জিজিয়া আদায়ের প্রশ্ন, ইরাক ও সিরিয়া কে সৈন্যদের বন্টন করার প্রশ্ন, নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত ওমরের (রাঃ) অংশগ্রহণ সমস্যা, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শাসনকর্তা নিযুক্তি, সেনাপতির মনোনায়ন দান, গনীমাত অর্থাৎ যুদ্ধলদ্ধ সম্পদবন্টন, সৈন্যদের বেতন নির্ধারণ, হিজরী সনের প্রবর্তন, দপ্তর বন্টন ব্যাবস্থা, মহামারী এলাকায় প্রবেশের প্রশ্ন, বিদেশী ব্যাবসায়ীদের উপর শণ্ডুল্ক আরোপ, আফ্রিকার যুদ্ধ, বায়তুলমাল সম্পর্কিত প্রশ্ন ইত্যাদি।[৯]

অষ্টাদশ শতকে ফরাসী রাষ্ট্র বিপণ্ঢবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বধীনতার বাণী নিয়ে দেখা দেয় গণতান্ত্রিক সরকার। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে তা আরো পরিস্কার রূপ গ্রহণ করে এবং গণতন্ত্রীয় সরকারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় এড়াবৎহসবহঃ ড়ভ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব,ভড়ৎ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব, নু ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব. অর্থাৎ ঃ গণতান্ত্রিক সরকার হবে দেশের সর্বসাধারণের সরকার, তাদের জন্য, তাদের দ্বারা গঠিত। তার ফলে সর্বসাধারণের ভোট দানের নীতি গৃহীত হয়েছে।[১০]

পশ্চিমা দেশের আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা হতে জনগনের সার্বভৌমত্ব মৌলিক ভিত্তি হিসেবে জন্ম লাভ করেছে। এভাবেই গণ সার্বভৌমত্বের বিষয়ের জন্ম হয় আর এটিকে সব রাষ্ট্রের মৌলিক গুনাবলীর একটি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।[১১]

ইসলাম শাসন-ব্যবস্থার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল এমনই এক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত পারিপার্শ্বিক রাজ্যগুলোতে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইসলাম রীতিমতো আইন-কানুনসহ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করেছিল। সার্বজনীন অধিকার ঘোষণা করে তা রক্ষার ব্যবস্থা করলো এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করলো। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শাসননীতি প্রবর্তন করলো এবং ন্যায়-বিচারের আদর্শ কায়েম করলো। কানুনের বৈষম্য এবং আইন থেকে ব্যক্তি বিশেষের অব্যাহতি নিষিদ্ধ হলো। ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসন ও ব্যক্তি প্রধান্যের একেবারে উচ্ছেদ করা হলো।[১২]

[৮] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ আখতার ফার‍্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১।

[৯] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ আখতার ফার‍্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

[১০] অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *‘ইসলাম ও মানবতাবাদ’*, ইসলামিক ফাউন্ডেশেন বাংলাদেশ, ১৯৮০,পৃ.৫০।

[১১] সম্পাদনা মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, অনুবাদঃ এম রহুল আমিন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, আগষ্ট ১৮, ২০০৫, পৃ.৭২।

[১২] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ মাওলানা নুর‍্দ্দীন আহমদ প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

ইসলাম কোন রাজতন্ত্র বা উত্তরাধীকার নির্বাচনে পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন সমর্থন করে না। অনেক ইসলামী পন্ডিতের ন্যায় প্রফেসর জন ডল ও জন হিসপোসিটো বলেন যে, তাওহীদ ও খলীফার কুরআনীক তাৎপর্য গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[১৩]
গণতান্ত্রিক শাসননীতি যার ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণের জন্য ইসলাম, বর্তমান গণতন্ত্র এবং সার্বজনীন অধিকার সম্মুখে রেখে বিভিন্ন বিষেয়ের পর্যলোচনা আবশ্যক।

একটি উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতর রাষ্ট্রের আদর্শ কি? এ প্রশ্নের জবাবে বহু নির্যাতন ও নিপীড়নের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপণ্ডবের পর যা সৃষ্টি হয়েছিল তার চেয়ে উত্তম কোন আদর্শ আমাদের বর্তমান রাজনীতির সাহিত্যগুলো পেশ করতে পারেনি। আজকের গণতান্ত্রিক দেশগুলো এ আদর্শই গ্রহণ করেছে।
এর স্বরূপ হলোঃ

* রাষ্ট্র জনসাধারণের কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়।
* দেশের নাগরিক মাত্রই অধিকার এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান।
* রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রেসিডেন্ট (ইসলামী পরিভাষায় যাকে ইমাম বা খলিফা বলা হয়) জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং আইনের দৃষ্টিতে তিনি একজন নাগরিক তুল্য।
* দেশের সর্ববিধ কাজ এবং শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের মতানুসারে পরিচালিত হবে।
* রাষ্ট্রের ধনাগার জনসাধারণের সম্পত্তি, জনসাধারণ বা জনপ্রতিনিধিদের রায় ব্যতীত রাষ্ট্রের সাধারণ ধনাগারের অর্থ ব্যয় কারো অধিকার নেই।

রাষ্ট্র জনসাধারণের তা কোন ব্যক্তির বা খান্দানী মিরাস নয়। এ-ই হলো সমগ্র আলোচনার মূলসূত্র এবং গণতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ। রাষ্ট্র জনসাধারণের, কোন ব্যক্তি বা গোত্রের নয়। এ দাবীর প্রমান কুরআন নিজ ভাষায় করেছে।
কুরআন বলেছে ঃ
হে নবী! শাসনকার্যে মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ কর"ন।[১৪]

ইসলামী শাসন-পদ্ধতির ব্যাখ্যায় কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ
'তাদের হুকুমত পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে গঠিত।[১৫]
উপরোলিণ্ডখিত দু'টি আয়াতের প্রথমটিতে হুকুমতের বেলায় সাধারনের রায় গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে।

[১৩] এযরং ঢ়ধৎধমৎধঢ়য রং নধংবফ ড়হ উংঢ়ড়ংরঃড় ধহফ ঠড়ষষ, ওংষধস ধহফ উবসড়পৎধপু, ২৫-২৬
[১৪] আল কুরআন, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯।
[১৫] আল কুরআন, সূরা: শূরা, আয়াত: ৩৮।

দ্বিতীয়টিতে সে অনুসারে রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার স্বীকৃতি রয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়নের কার্যকারীতা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ(সা:) সম্পর্কে হযরত আয়েশা(রা:) সাক্ষ্যদান করেন ঃ অর্থাৎ--
জনমত নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে রাসুলের চাইতে বেশি অগ্রসর আমি আর কাউকে দেখতে পইনি।[১৬] (বগভি)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে--

* প্রথমত: ইসলামী হুকুমতে জনসাধারণের রায় গ্রহনের শর্ত।
* দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে জনসাধারণের দিকে যার দ্বারা নিশ্চিতর"পে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয় বরং এ হচ্ছে রাষ্ট্রের জনসাধারণের অধিকার ভূক্ত।
* তৃতীয়ত: ইতিহাসের মুখাপেক্ষী না হয়ে কুরআনই ঘোষনা করেছে যে, মুসলমানদের প্রাথমিক যুগে মুসলিম জনসাধারনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হত। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোর দাবী প্রমানের জন্য অবশ্য আমাদের অন্য কোন দলিল-প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। ঘটাবলীর ধারাবাহিকতা এবং ইসলামী বিরোধীদের জবাবের এবং এই প্রসঙ্গে মাত্র কতগুলো দৃষ্টান্তের উলেণ্ডখ করছি। যাতে করে ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শের কার্যকর প্রবনতা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(ক) খোদ হযরত রাসূলে করীম (সা:) এবং তাঁর খলিফাদের কেউ তাদের আত্নীয় স্বজন কিংবা সন্তানদের তাঁদের স্থলবর্তী নিযুক্ত করেননি।

(খ) সর্ববিধ জর"রী কাজে খোদ হযরত রাসূল (সা:) বিশেষ ভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন, আনসার, মুহাজিরীন এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণ মুসলমানদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

(গ) খলীফাদের নির্বাচন সাধারণত: জনসাধারণের রায়ের ভিত্তিতেই হতো।

(ঘ) বায়তুলমাল জনসাধারণের সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। ব্যাক্তির প্রয়োজনে কখনো তা ব্যয় করা হতো না। সে কারনেই তার নামকরণ করা হয়েছিল মুসলমানদের "বায়তুলমাল"।

ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদ ব্যক্তিতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে উপরোক্ত দফাগুলো ইসলামী রাষ্ট্রে খুজে পাওয়া যেত না।

মোট কথা, পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রমান ছাড়াও সাধারণ সভায় খলিফাদের নির্বাচন স্বাধীন এবং নির্ভীকভাবে খলীফাদের ফরমান এবং কার্যবলীর সমালোচনা, জর"রী বিষয় সমূহে প্রতিনিধি স্থানীয় এবং 'আহলে হলণ্ড-অল্-আক্দ' ১ এর মতামত গ্রহন, ব্যক্তি বিশেষের জন্য বায়তুলমাল নিষিদ্ধকরণ এ কথারই সুনিশ্চিত প্রমান বহন করে যে, জনসাধারণের শক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তির উৎস স্বৈরাচার মূলক কোন ব্যক্তিতন্ত্রের নাম ইসলামী রাষ্ট্র নয়।

[১৬] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: আখতার ফার"ক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮।

রাষ্ট্রের জনসাধারণ মৌলিক অধিকার, আইন এবং শাসননীতিতে সমান মূলত: ইসলামের সুস্পষ্ঠতম বৈশিষ্ঠ্য হলো এই যে, তার দৃষ্টিতে প্রভূ এবং ভৃত্য, উচ্চ এবং নীচ, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, ধনী এবং দরিদ্র সব সমান। হযরত সোহাইব এবং বিলাল ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। অথচ কোরেশ প্রধানদের পাশাপাশি তাঁদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। ইসলামে কেবলমাত্র একটিই বিষয় রয়েছে, পরস্পরের মর্যাদার মধ্যে যা তারতম্য সৃষ্টি করে এবং তা হচ্ছে তাক্ওয়া এবং সৎকাজ।[১৭]

'তোমাদের মধ্যে সেই বেশি মর্যাদার অধিকারী, যে অধিক মুত্তাকী।' হযরত রাসূল (সা:) একটি মাত্রই কথাই মর্যাদার ব্যবধান ঘোষনা করে দিয়েছেন অর্থাৎ মর্যাদা হচ্ছে তাক্ওয়া।[১৮]অর্থাৎ দ্বীন এবং তাক্ওয়া ছাড়া একের প্রতি অপরের কোন মর্যাদা নাই।[১৯]
'সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি সুতারাং সবাই সমান।' আইনগত সাম্যের সত্যিকার দৃষ্ঠান্ত কেবল ইসলামের আদর্শ থেকেই লাভ করা সম্ভব। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে শাসক, শাসিত, রাষ্ট্রনায়ক এবং জনসাধারনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম আগমনের পূর্বে সাধারণ নাগরিকের সাথে বাদশাহ্র ও এক সাধারণ মানুষের ন্যায় আদালতে উপস্থিত হওয়া কি কখনো সম্ভব ছিল? ইসলামই কেবল সেই দৃষ্টান্ত পেশ করেছে।
খলীফা হযরত ওমর(রা:) এবং আবি ইবনে সাবেতের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। বিষয়টি বিচারের জন্য যায়েদ ইবনে সাবেতের সমক্ষে উপস্থিত হলো। হযরত ওমর(রা:) আদোলতে পৌঁছলেন তাঁর সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে স্থান খালি করে দেওয়া হলো। হযরত ওমর(রা:) বললেন, ইবনে সাবেত! এ মোকদ্দমার বেলায় এখনি তুমি যা করলে এ হচ্ছে প্রথম বেইনসাফী। হযরত ওমর তাঁর বাদীর বরাবর হয়ে আদালতে আসন গ্রহণ করলেন।[২০]

হযরত আলী (রা:) একবার বিবাদী রূপে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে বাদীর সমপর্যায়ে আসন গ্রহণ করতে হয়েছিল।[২১]
জাবালা ইবনে আইহাম ছিল গাস্সান বংশীয় এক খৃষ্টান রাজপুত্র। হযরত ওমর ফারূকের খেলাফতের সময় সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কাবাগৃহ তওয়াফের সময় তার গায়ের চাঁদরের এক প্রান্ত অপর এক জনের পায়ের তলায় পড়ে গিয়েছিল। জাবালা তার মুখের ওপর এক চপেটাঘাত করে বসলো। অপর ব্যক্তিও তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। জাবালা এবার ক্রোধে অধীর হয়ে পড়ল। সে এসে খলীফা হযরত ওমরের দরবারে এর প্রতিকার প্রার্থনা করলো। হযরত ওমর (রা:) বললেন; 'তুমি যেমন করেছ তার প্রতিফলও তেমনি ভোগ করেছ।' জাবালা বললো, 'কেউ আমাদের সাথে বে-আদবী করলে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।' হযরত ওমর(রা:) বললেন; 'হ্যাঁ জাহেলিয়াতের যুগে তাই হতো, কিন্তু ইসলাম সম্ভ্রান্ত, ইতর,উচ্চ-নীচের সীমারেখা মুছে দিয়েছে।' জাবালা ক্রোধ সামলাতে পারলোনা, সে ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেল এবং পালিয়ে রোমে চলে গেল । কিন্তু খলীফা ইসলামের সাম্য ক্ষুণ্ন হওয়া বরদাশ্ত করলেন না।[২২]
ইসলামে ভৃত্য ও মনিব সবাই সমান। কোন এক সাহাবী তাঁর এক ভৃত্যকে প্রহার করেছিলেন। হযরত রাসূল(সা:) তাকে বললেন, 'সে তোমার ভাই'। তুমি যা খাও তাই তাঁকে খেতে দাও, তুমি যা পরিধান কর তাই তাকে পরিধান করাও।

খুলাফায়ে রাশেদীন যাঁরা ইসলামের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন তাদেরও আদর্শ ছিল এ-ই। হযরত ওমর (রা:) প্যালেস্টাইন সফরের কালে তাঁর খাদেমের সাথে পালা করে উঠে চড়তেন। অবশেষে তারা যখন নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন উঠের রজ্জু ছিল খলিফার মুঠায় আর খাদেম ছিল উঠের পিঠে সওয়ার; অথচ সে মুহূর্তটি ছিল এমন যে, মুসলমানদের মহান খলীফার শান-শওকতের জৌলূস দেখার জন্য সারা শহর ভেঙ্গে পড়েছিল।[২৩]

আজনাদীনের ঘটনায় রোমীয় দুত মুসলিম ছাউনী থেকে ফিরে এসে রোমীয় সেনাপতির কাছে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে অবাক বিষয়ে উক্তি করলো ঃ
মুসলমানরা রাত্রিতে ইবাদতে আত্ন-সমাহিত, অথচ দিনে তারা দুরন্ত অশ্বারোহী বীর। তাঁদের রাজপুত্রও যদি চুরি করে তার হস্ত ছেদন করা হয়, যদি ব্যভিচার করে, তাকে প্রস্তরঘাতে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।[২৪]

রাসুল(সা:) যিনি ৬ষ্ট শতাব্দীর অন্ধকার পৃথিবীতে স্বধীনতা এবং সাম্যের আলো প্রজ্জলিত করলেন এবং ঘোষন করলেন ঃ 'মুহম্মদের কন্না ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে নিশ্চয়ই তার হাত কাটা যাবে।'[২৫]

এ হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সত্যিকার রূপ, এবং সাম্যের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মহানবীর নিজের আদর্শ।

একথা সত্য যে, ফরাসী বিপণ্ঢব ইউরোপকে স্বৈরতন্ত্র, জবরদস্তিমূলক শাসন এবং ব্যক্তি প্রধান্য থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সর্বত্র আইনের মর্যাদা সবার উর্ধে বলে গণ্য করা হচ্ছে। সাম্য এবং স্বধীনতার স্লোগানে ইউরোপের প্রতিটি অঞ্চল মুখরিত। ইংল্যান্ডের রাজাকে আইনের অধীন বলে গন্য করা হয়। আমেরিকা এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এক এক জন শাসনতান্ত্রিক প্রধানের অধিক কিছু নয় বলে বলা হয়। কিন্তু যদি ঘটনাবলী এবং দৃষ্টান্তগুলো সমানে রাখা হয় তা'হলে দেখা যাবে যে, সেখানে এই সভ্যতা এবং স্বাধীনতার যুগেও উচ্চ-নীচ এবং পরস্পরের মধ্যে আইনের সেই তারতম্য এখনও বর্তমান।

ইউরোপের সেই বিচারালয়গুলোর সন্ধান দাও। যেখানে রাজা বা শাসনতান্ত্রিক প্রধান সাধারণ একজন প্রজার অভিযোগের জবাব দেবার জন্য হাজির হয়। আমাকে আইনের সেই সম-দৃষ্টি দেখাও , যেখানে একজন

[১৭] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।
[১৮] 'তিরমিযি বাব-ই মুফাখখিরাত'
[১৯] 'মিশকাত বাব-ই মুফাখখিরাত'
[২০] 'কিতাবুল খুরুজ'
[২১] 'ইকদুল ফরীদ'
[২২] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।
[২৩] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫
[২৪] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫।
[২৫] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ,প্রাগুক্ত,পৃ.১৮।

সৈনিকের পুত্রের চুরির শাস্তির ন্যায় রাজ কন্যারও চুরির শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আজো কি আইনের দৃষ্টিতে কার্যত উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ করা হয় না? এ ঘটনা এ কালের নয় কি? জনৈক বাদীর মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ঘোষনা করেছিল যে, রাজা আদালতে হাজির হন না এবং উচ্চ হতে উচ্চতর আদালত তাঁর নামে সমন জারী করতে পারে না। এটা ঘোষনা মাত্রই নয়, এ হচ্ছে আইন। আইনের সমানাধিকার ঘোষিত হওয়া সত্বেও রাজাকে আদালতে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংগ্রাম সাধনার পরে পৃথিবী আজো এর অধিক আযাদী অর্জন করতে পারেনি। অথচ ইসলাম গনতান্ত্রিক ধারায় অন্ধকার পৃথিবীতে স্বধীনতা এবং সাম্যের আলো প্রজ্জলিত করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো

রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং সাধারণের তুলনায় তাঁর কোন অধিকার সংরক্ষিত থাকবে না। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, খূলাফায়ে রাশেদীনের কারো নির্বাচন উত্তারাধিকারসুত্রে বা জবরদস্তিমূলকভাবে হয়নি। বরং তা হতো মুসলমান জনসাধারণের প্রকাশ্য মজলিসে মুহাজির এবং আনসারদের সংখ্যাধিক্যের মতে (যারা উচ্চ পরিষদের স্থলবর্তী ছিলেন) এবং সাধারণ মুসলমানদের সমর্থনে (যারা সাধারণ পরিষদের তুল্য ছিলেন) হযরত আবুবক্করের নির্বাচন অনুষ্টিত হয়েছিল বনু সায়েদায় হযরত ওমরের প্রস্তাবে, আনসার ও মুহাজিরদের সমর্থনে এবং সাধারণ মুসলমানদের সম্মতিতে। হযরত ওমরের নির্বাচন হয়েছিল হযরত আবু বকরের প্রস্তাবে; আনসার, মুহাজির ও সাধারণ মুসলমানদের সমর্থনে ও স্বীকৃতিতে । হযরত ওসমানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আব্দুর রহমান বিন আওফ প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি পরিষদের মারফতে এবং মদীনার সাধারণ মুসলমানদের সমর্থনে। এভাবে হযরত আলীর নির্বাচন মিশর ও মদীনাবাসীদের প্রস্তাবে ও সমর্থনে কার্যকরী হয়েছিল।[২৬] হযরত ওমর তো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেছিলেন ঃ জনসাধারনের সমর্থনেই কেবল খিলাফত গঠিত হতে পারে।[২৭]

হযরত আলী এর খিলাফত অনুষ্ঠান এবং হযরত মুয়াবিয়ার পদত্যাগের ব্যাপারেও জনসাধারণের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। আমীর মুয়াবিয়া হযরত আলী (রা:) কে লিখেছিলেন, আপনাকে কারা খলিফা করলো? তার জবাবে হযরত আলী লিখলেন ঃ 'হযরত আবুবকর ,ওমর এবং ওসমানের প্রতি যারা বায়য়াত করেছিলেন এবং যে শর্তে বায়য়াত করেছিলেন, তারাই সেই শর্তে আমার হাতেও বায়য়াত করেছেন। যারা নির্বাচন সভায় উপস্থিত ছিলো নিজেদের মতের উপরে তাদের অটল থাকার অধিকার নেই এবং যারা নির্বাচন সভায় অনুপস্থিত ছিল, অনুপস্থিতির কারণে জনসাধারণের রায় অগ্রাহ্য করার অধিকার তাদের নেই। আনসার এবং মুহাজিররাই রায় দেবার অধিকারী। তাঁরা যদি কোন ব্যক্তির প্রতি একমত হয়ে যান এবং ইমাম নির্বাচন করেন, তা জনসাধারণের রায় বলেই গ্রাহ্য হবে। সুতারাং যদি কেউ তাঁদের সর্বসম্মত রায় থেকে কোন দোষারোপ করে বা বিদ্আতের কারণে আলাদা হয়ে যায় তবে তার প্রতি অবশ্য কর্তব্য হবে তাকে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করানো এবং যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের সাথে একমত হতে বাধ্য করা। যদি সে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে সর্বসাধারণ মুসলমানদের সিদ্ধান্তের খাতিরে তাদের সাথে লড়াই করা হবে।[২৮]

[২৬] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুর-উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০।

[২৭] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুর-উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০।

[২৮] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুর-উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০-২১।

এখানে একটি শব্দের শাব্দিক অর্থ বলা বিশেষ প্রয়োজন যা 'বায়য়াত'(জনগনের নৈতিক বা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের পবিত্র শপথ)।[২৯]

প্রকৃত কথা এই যে, হযরত আলী এই কয়েকটি কথায় খলীফা নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উৎকৃষ্টতম ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা এমন নিখুঁত যে, তাঁর চাইতে উত্তম ব্যাখ্যা আর কিছু হতে পারে না।

ইসলামের প্রতিনিধি নিয়োগে কখনও নির্বাচন, কখনো মনোনয়ন, কখনও বা নির্বাচনের জন্য প্যানেল মনোনায়ন করা হয়েছে। খলিফা ওমর (রা:) এর নির্দেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান সর্বসাধারণের নির্বাচনই হবে আলণ্ঢাহ্ ও রাসুল (সা:) এর খলীফা নিয়োগের ভিত্তি।[৩০]

ইসলাম সাধারণ নির্বচন ব্যতীত খলীফা বা মনোনায়নের কোন পন্থা স্বীকার করেনি। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের গতি যে পূর্ণ গণতন্ত্রের অভিমুখী এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায়। এ আলোচনার পরে ইসলামে গণতন্ত্রের প্রধান অংশ নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই এ কথা কে বলতে পারে?

ইসলাম বিধি সম্মত সম্মান ও মর্যাদা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে খলীফার কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রধান্য ছিলনা। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর জীবনে অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি ঘটনাও নেই, যা সাম্যের আদর্শের বহির্ভূত ছিল। তিনি লোকদের মধ্যে এমনভাবে মিলে মিশে বসতেন যেন ঠিক তিনিও তাদেরই একজন। তিনি সর্বদা মুখেও বলতেন- হে আলণ্ঢাহ্! আমি দীন-হীন আমাকে দারিদ্রের সাথেই জীবিত রাখ, এবং আখেরাতে তাদের সাথেই উঠাও।'

আহার গ্রহনের সময় তিনি এমনভবে বসতেন, যেন একজন সাধারন অনুগত বান্দা। তারপর সবিনয়ে বলতেন: "আমি আলণ্ঢাহ্র বান্দা একজন বান্দার মতই আহার করি।[৩১]

ইসলামে খলিফার অধিকার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়নি, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা:) তাঁর খিলাফাতের সর্বপ্রথম ভাষণে যে উক্তি করেছিলেন তার অংশ বিশেষ হচ্ছে এই: 'হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি তোমাদের খলিফা নিযুক্ত হয়েছি যদিও আমি তোমদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নই। হে ভ্রাতৃগণ! আমি আলণ্ঢাহ্-রাসূলের অনুগত; কোন নতুন কিছু করার অধিকার আমর নেই। যদি আমি সঠিক পথে থাকি তবে তোমরা আমার সহযোগিতা করবে আর যদি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয় তবে তোমরা আমাকে শুধরিয়ে নিও।[৩২]

[২৯] স্যর সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদক: ড.রশীদুল আলম, '*দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*', আয়শা কিতাব ঘর, জুলাই,২০০২.পৃ.১৮৫।

[৩০] মোহাম্মদ আজরফ, '*ইসলামী আন্দোলন: যুগে যুগে*', ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল,১৯৮০, পৃষ্টা.১২।

[৩১] মূল মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুর-উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

[৩২] তবকাত', তৃতীয় খন্ড,পৃ.১২৯ ।

সিরিয়া বিজয়ের পর কোন একটি বিষয় নিয়ে মজলিসে সূরায় মতভেদ দেখা দিয়েছিল, তখন হযরত উমর বললেন ঃ

'আমিও তোমাদের মতো একজন বৈ নই। আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি যা চাই তোমরাও তাই মেনে নেবে। রাজতন্ত্র বা এক নায়কতন্ত্র জনগণের অর্থভান্ডারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে নিয়মতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অর্থভান্ডার কারোর ব্যাক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় না। জনগণের অর্থ তখন জনগণের স্বার্থেই খরচ করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রের পরিচালাকবর্গ তা থেকে প্রয়োজনীয় একটি পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি পেয়ে থাকেন।[৩৩]

ইসলাম সেখানেও এরূপ উজ্জল ও উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছে। যার তুলনা আজ পর্যন্ত মেলেনি। আজকের সর্বশ্রেষ্ট ইউরোপও গণতান্ত্রিক সরকারের এরূপ উত্তম নজীর কায়েম করতে পারেনি। লাখে লাখে টাকা আজও ইউরোপে শাসক বর্গের পেছনে উজাড় করা হচ্ছে। এখনও রাজপরিবারের পূজায় ও প্রেসিডেন্টের পদসেবায় সেখানে জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যায়িত হচ্ছে। ইউরোপে সম্রাটদের ব্যক্তিগত ভাতার হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, রাজ্যের ধন-ভান্ডার সেখানে অবারিতভাবে লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বৃটিশ সম্রাটের ব্যক্তিগত বেতন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের হিসাবেঃ

পকেট খরচ ---		১১০০০০ পাউন্ড
পুরস্কার এবং দান-দক্ষিণা ---	১৩২০০	পাউন্ড
কর্মচারীদের বেতন ---		১২৫০০০ পাউন্ড
প্রসাদ অট্টালিকা বাবদ --		১০৩০০০ পাউন্ড
রাজকীয় প্রসাদের আসবাব ---	২০০০	পাউন্ড
উপকরন ও বিবিধ ---		৮০০ পাউন্ড

টাকার হিসাবে সে সময়ে ইহা ৭০,৫০,০০০ হাজার টাকা। এই হিসাবে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের তিন লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য রাজপুত্রদের খরচের হিসাবও এতে ধরা হয় নাই। সত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা শুধু সম্রাটের নিজের জন্যই নির্দিষ্ট।[৩৪]
নমুনা হিসাবে সর্বাপেক্ষা প্রধান সম্রাটের খরচের হিসাবটাই এখানে দিয়েছি।

[৩৩] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ আখতার ফারুক,প্রাগুক্ত, পৃ.১৮১।
[৩৪] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২।

খলিফা হওয়ার দাবীতে ইসলাম তাকে এই অধিকার দিতে রাজী নয়, যে লাখো লাখো মানুষের মাথায় সাধারণ টুপী হবে এবং একজনের টুপী হীরা-মোতি দিয়ে জড়িয়ে রাখা হবে। মদিনার সে 'পবিত্র বাদশাহ্' চাটাইর উপর শয্যা গ্রহণ করতেন এবং তাঁর দেহে দাগ কেটে যেত। তারই স্থলবর্তী খলীফা যখন রোম এবং অনাবর সাম্রাজ্যগুলোর সিংহাসন উৎপাটিত করে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন তাঁর দেহেও ছিল দীর্ণ কম্বল এবং তিনি শয্যা গ্রহণ করতেন পত্র-নির্মিত কুটিরে।[৩৫]

এই ছিল হুজুর (সাঃ) ও খলিফাদের বাসস্থানের অবস্থা আর বেতন ভাতার সমীক্ষা ছিল আরো আশ্চার্যজনক।
খলিফাদের নিজের খরচের জন্য দাবী কি ছিল? নবী করীম (সাঃ) এর যুগে বিজিত দেশগুলো যে সব ধনসম্পদ আমদানী করা হত তা থেকে তিনি শুধু ততটুকুই গ্রহণ করতেন যা এক দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় ভরপোষণের জন্যে অপরিহার্য মনে করে থাকে। অধিকাংশ সময় অবস্থা এই দাঁড়াত যে, সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে স্বয়ং আরবের 'শাহানশাহ্' ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে নিতেন। মাসের পর মাস যেত তার ঘরে উনুন ধরানোর সুযোগ ঘটত না। অধিকাংশ রাতেই তিনি তেল জুটিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে সমর্থ হতেন না। এরূপ চরম সংকটময় মূহুর্তেও জনগণের অর্থভান্ডার থেকে তিনি একটি পয়সাও গ্রহণ করা ঠিক মনে করতেন না। তাঁর ইন্তেকালের পরে দেখা গেল যে, এক ইয়াহুদীর কাছে কয়েক সের গমের বিনিময়ে তার ঘটি বন্ধক রাখা হয়েছিল।[৩৬]

খুলাফায়ে রাশেদীনও এ মহান আদর্শের অনুসারী ছিলেন। চার খলিফার ভেতর কারুরই এ অধিকার ছিল না যে, জনগনের অর্থভান্ডার থেকে মাসিক নির্ধারিত যৎসামান্য ভাতাটুকু ব্যতীত এক পয়সাও গ্রহণ করবেন।
ইসলামের খলীফার নিজের খরচের জন্য দাবী কি ছিল?
হযরত ওমর(রাঃ) এর একটি উক্তিতে জানা যায়-
বায়তুল মাল থেকে আমার জন্য কি গ্রহণ করা বৈধ, তা আমিই বলছি। দুই প্রস্ত পোশাক, একটি শীতের , একটি গ্রীস্মের ; হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য একটি উষ্ট্র নিজের ও পরিবার বার্গের জন্য একজন মধ্যম শ্রেণীর কোরেশের খোরাক। তারপর আমি একজন সাধারণ মুসলমান- তাদের যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা।[৩৭]

রাষ্ট্রের সম্পদ জনসাধারণের তা সঠিকভাবে ব্যবহার ও হেফাজতের দায়িত্ব শাসকের এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইসলাম হাজির করতে পেরেছে- একদা হযরত উমরের (রাঃ) স্ত্রী সাইয়েদা উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতিমা (রাঃ) কনস্টান্টিনোপল যাত্রী এক মুসলিম দূতের মারফত রোম সম্রাটের স্ত্রীর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠালেন। ওদিকে তা পেয়ে কায়সরের স্ত্রীও এক রোমক দুতের মারফত বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখন একথা জানতে পারলেন তখন ঘরে এসে সেই মহামূল্যবান উপঢৌকন হস্তগত

[৩৫] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।
[৩৬] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ আখতার ফারুক,প্রাগুক্ত,পৃ.১৮২।
[৩৭] মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদঃ মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩।

করলেন। তারপর তা 'বায়তুল মাল' এ জমা দিয়ে স্ত্রীকে বললেনঃ এ হচ্ছে সর্বসাধারণ মুসলমানের প্রাপ্য। আমার খলিফা হবার আগে কি তোমার কাছে কোনদিন কায়সরের স্ত্রী উপঢৌকন পাঠিয়েছে?"[৩৮]

হযরত ওমর(রা:) ভাষনটি তাতে তিনি খলীফার সাথে জাতীয় অর্থভান্ডারের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেনঃ

অর্থাৎঃ তোমাদের 'ধনভান্ডার' ও আমার ভেতরকার সম্পর্ক হল ইয়াতীম ও অভিভাবক সম্পর্ক। যদি আমার সামর্থ থাকে তা হলে তা থেকে কিছুই গ্রহন করব না। যদি অভাবগ্রস্থ হই, তা হলে কোনমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত কিছু তা থেকে নেব।

জনগন! আমার ওপরে তোমাদের কয়েকটি অধিকার রয়েছে। তা তোমাদের দাবী করা উচিত। আমার ওপরে তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে, আমি যেন অবৈধভাবে রাজস্ব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা না করি। আমার ওপরে তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে, রাজস্ব ও যুদ্ধলব্ধ যা কিছু সম্পদ জমা হবে তা যেন অবৈধভাবে খরচ না করি। আমার ওপরে তোমাদের এ দাবী ও রয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের বেতন ও ভাতার হার বাড়িয়ে দিই।"[৩৯]

হযরত ওসমান (রা:) নিজের ব্যাপারে এ পন্থা অনুসরণ করে চলতেন। হযরত আলী (রা:) ও কঠোরভাবে এ নীতি অনুসরণ করে গেছেন। আব্দুলণ্ঢাহ বি যম'আ যখন অনুচিতভাবে তাঁর কাছে 'বায়তুল মাল' থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল তখন তিনি জবাব দিলেন ঃ

অর্থাৎঃ এ ধন আমার নয়, তোমারও নয়। এ হচ্ছে সর্বসাধারণ মুসলমানের গচ্ছিত ধন।[৪০]

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তাঁর কাছে দুটি প্রদীপ রাখতেন। রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য একটি এবং ব্যক্তিগত কাজের জন্য অপরটি ব্যবহার করতেন। প্রথমটি তেল খরচ ছিল সরকারের ও দ্বিতীয়টির তেল খরচ তিনি নিজেই বহন করতেন।[৪১]

হযরত মুয়ায আরবের আমীরের আদর্শ নিজ ভাষায় বর্ননা করলেনঃ

আমাদের খলীফা আমাদের মধ্যে থেকেই একজন। যদি তিনি আমাদের দ্বীনের কিতাব এবং নবীর আদর্শ বহাল রাখেন তবে আমরা তাকে খলীফা হিসাবে বহাল রাখি; অন্যাথায় তাকে আমরা পদচ্যুৎ করি। যদি তিনি চুরি করেন তবে তার হাত কাটা যায়; যদি ব্যভিচার করেন তাঁকে প্রস্তরঘাতে উড়িয়ে দেই; যদি তিনি আমাদের কাকেও গালি দেন তবে সেও তাঁকে সেই পরিমান গালি দেয় । যদি তিনি কাকেও আহত করেন, তবে তিনি তার বদলা ভোগ করেন। তিনি আমাদের অগোচরে পৃথককক্ষে অবস্থান করেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে

[৩৮] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: আখতার ফার"ক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩।

[৩৯] আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ.৬৭।

[৪০] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: আখতার ফার"ক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪।

[৪১] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: আখতার ফার"ক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫।

কোন অহংকারের ব্যবহার করেন না। তিনি গনিমত বন্টনে আমাদের তুলনায় নিজকে প্রাধান্য দেন না। তিনি আমাদের ন্যায়ই একজন সাধারণ মানুষ।[৪২]

উপরোক্ত বর্ণনাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করূন। এর চেয়ে খোলাসা এর চেয়ে উৎকৃষ্ট, এর চেয়েও নিখুঁত এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সম-অধিকারের ব্যাখ্যা করা কি সম্ভব? জনসাধারণের হুকুমত এর চেয়ে উৎকৃষ্টতম কোন স্বরূপ হওয়া কি সম্ভব? শ্রেণীসাম্য এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য রহিতকরণের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাস উপস্থিত করতে সক্ষম হবে কি?

এসব ঘটনাবলীর পরেও কি বলা চলে, ইসলাম শাসন গণতান্ত্রিক নয়? এর চাইতে উত্তম গণসরকারের নজীর দুনিয়ার আর কোথাও মিলবে কি? অতীতের ইতিহাস কি তার প্রমাণ দেবে? ভবিষ্যতেও কি এরূপ গণতন্ত্র দেখার সৌভাগ্য কারূর হবে?

ফরাসী বিপণ্ঢবকেই ইউরোপের বর্তমান গনতন্ত্র ও স্বাধীনতার উৎস বলা হয়ে থাকে। ফরাসী গণতন্ত্র ব্যাখ্যা বিশেণ্ঢষণ করলে শুধু কয়েকটি দফাই মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ব্যাক্তি শাসন রোহিতকরণ, সর্ব-সাধারনের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন এবং 'শূরা'প্রতিষ্ঠা। এই চারটি দফাকেই মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো বিশেণ্ঢষণ করলে যে একটি মূলনীতিই শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট থেকে যায় তা হচ্ছে ব্যাক্তি শাসনের উচ্ছেদ এবং ক্ষমতা জনসাধারনের করায়ত্তকরণ। গণতান্ত্রিক শাসনের উপরোক্ত চারটি মৌলিক নীতি সামনে রেখে আমি ইসলামী শাসন বিধান সম্পর্কে প্রাথমিক মুসলিমদের আদর্শ বিশেণ্ঢষণ করেছি এবং প্রত্যেকটি দফা যথাক্রমে আলোচনা করেছি। যা নিম্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

* ইসলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তি প্রাধান্য নিষেধ করে। ইসলাম সর্বপ্রথম যে হুকুমত কায়েম করেছিল, তা নিখুঁত গণতান্ত্রিক এবং ব্যক্তি প্রধান্য থেকে মুক্ত ছিল। কুরআন শরীফের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আদর্শ থেকে ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ ব্যতীতই একথা স্পষ্টভবে প্রমানিত রয়েছে যে, রাষ্ট্র জনসাধারনের, ব্যাক্তি বা গোত্রের তাতে হাত নেই, বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হচ্ছে মূলনীতি।
* ব্যক্তি শাসন রহিতকরনের অনিবার্য ফল হলো জনসাধারনের সম-অধিকার। অর্থাৎ গোত্রীয় দেশগত, জাতিগত এবং অর্থগত কোন বৈশিষ্ট ইসলামে নেই। ইসলাম তার প্রথম দিনেই ঘোষণা করেছে: 'দ্বীন ও তাকওয়া ব্যতীত একজনের নিকট অপরের কোন বৈশিষ্ট্য নেই।'
* গণতন্ত্রের তৃতীয় শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান। ইসলাম তাকে 'খলিফা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইজ্মার অর্থ হচ্ছে সংখ্যাধিক্যের ভোট।
* খাঁটি গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণতার জন্য এখানে প্রয়োজন রয়েছে, জনসাধারনের মোকাবেলায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের যেন আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে। আইনগত এবংং অর্থনৈতিক বিচারে সেও সাধারণ একজন নাগরিকের মত হবে।

[৪২] মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অনুবাদ: মাওলানা নুর"দ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪।

এদিক থেকে পর্যালোচনা করার পর যা দেখতে পাচ্ছি, তা হলো এই যে, 'গায়ে জীর্ণ চাঁদর এবং দুই বেলার খাদ্যের সংস্থান ব্যতীত খালি ঘর হাতে আর কিছুই বাকী থাকবে না।'

উপরোক্ত আলোচনা সুত্রে ইসলামী শাসন বিধানের আরো অনেক বৈশিষ্টের সন্ধান লাভ করেছি। আমরা শুধু এতটুকু দেখতে পাইনি যে, গণতন্ত্র এবং আইনগত সমানাধিকারের নামে বর্তমান সভ্যতায় আজ যা কিছুই পেশ করা হচ্ছে তা সবই ইসলামে মজুদ রয়েছে, বরং এই স্তুপিকৃত আলেখ্য এখনো সেই মহান সত্য এবং অনুপম তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত- প্রায় পনের শত বছর অতীতে যা উপস্থিত করা হয়েছিল।

প্রকৃত স্বাধীনতা এবং ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুটো দিক সামনে আসে। এক হলো ইউরোপের স্বাধীনতার বাজারে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দ্রব্য যা প্রদর্শিত হচ্ছে প্রায় পনের শত বছর পূর্বেই তা ইসলাম ভান্ডারে সঞ্চিত রয়েছে।

পর্যালোচনার অপর অংশ হলো যে, সেগুলো অসম্পূর্ণই নয় বরং তার চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ ইসলামের ভান্ডারে মওজুদ রয়েছে। এই পরবর্তী অংশের প্রতি কোথাও কোথাও আলোকপাত করেছি। তার সারমর্ম হলো এইঃ

* ইসলাম তার শাসনতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্র সর্বতোভাবে উচ্ছেদ করেছে এবং নিখুঁত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তাতে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের পদ রাখা হয়েছে যাকে খলীফা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ইউরোপে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজো পূর্ণতায় পৌঁছায়নি। যে দেশের বৃহত্তর অংশ এখনো মুকুট এবং তখতের সম্মুখে অবনত হতে বাধ্য। আমেরিকা এবং ফরাসী এ দুটো প্রধান গনতন্ত্রই শুধু ফরাসী বিপণ্ঢবের ফল। এছাড়া কতগুলো ছোট ছোট গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও রয়েছে। প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সেগুলো গণ্য হয় না।
* সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল বিপণ্ঢবের মূল লক্ষ্য। তা শুধু রাজশক্তি উচ্ছেদকরণের দ্বারা খাঁটি গণতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, যতক্ষণ না জনসাধারনের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী বিপণ্ঢব যদিও রাজ শক্তির একনায়কত্ব থেকে দুনিয়াকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্ত সত্যিকার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার বেলায় সে সফলকাম হতে পারেনি। বিভিন্ন সমাজ এবং শ্রেণীগত বৈষম্য অবশিষ্টই রয়েছে। ধনতান্ত্রিক শক্তির অভিশাপ থেকে দুনিয়া আজো মুক্তি পায়নি। উচ্চ-নীচের ভেদ বৈষম্যের শৃঙ্খলে আজো সে আবদ্ধ।

* রাষ্ট্রের সাধারণ খাজাঞ্চীখানা থেকে রাজা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে এবং একজন সাধারণ নাগরিক হওয়া সত্বেও সাধারণ নাগরিকের তুলনায় সে উচ্চ মর্যদায় সমাসীন সেটা কি ধরনের সাম্য?

যেখানে রাজ-রাজাদের সম্মান ও মর্যদার আসন আসমান ছুয়েছে সেখানে মাটির সাধারন মানুষের পৌঁছাবার কোন অধিকার নেই। ইংল্যান্ডের রাজা সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা

প্রতিবছর শুধু তাঁর নিজের জন্যই যেখানে ব্যয় করছেন যেখানে সাম্যের দাবীর কি অধিকার রয়েছে?

সে দেশে এখনো জনসাধারনের জন্য ধনীদের প্রসাদ দ্বার রুদ্ধ। স্বর্ণ রৌপ্যের গর্বে তারা মানুষের সাথে যে কোন ব্যবহার করতে পারে।

তাহলে কোথায় সেই সাম্যের ফেরেশতা ইউরোপময় যার পক্ষপুটে আবৃত করে রেখেছে, বলে বলা হয়? কিন্তু ইসলাম সে তো তার প্রভাতেই সাম্যের খাঁটি নমুনা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে। ইসলামের সর্বপ্রথম পবিত্র বাদশাহ, কিভাবে জীবন যাপন করতেন তার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর খলীফা পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেনঃ দুই প্রস্ত কাপড় এবং আমার ও পরিবার বর্গের খোরাক এই পর্যন্ত।

হযরত খাতামূল মুরসালীন (সাঃ) মখযুম গোত্রের এক নারী সম্পর্কে কোরেশ প্রধানদের কাছে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক তাঁর খিলাফতের সর্ব প্রথম ভাষণে হযরত মায়াজ রোমক সেনাপতির সম্মুখে, মুগীরাহ বিন শা'বা ইরানী সেনাপতি সম্মুখে, এবং আজনাদানের ঘটনায় কাসেদ রোমক সেনাপতির সমীপে যে উক্তি করেছিলেন তা আবার পাঠ কর, তারপর ইউরোপের সাম্যের মোকাবিলায় ইসলামী সাম্যের আদর্শ তুলনা করে দেখ।

সাম্যেরও বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। একথা সত্য যে, ফরাসী বিপণ্ঢব তার স্বধীনতার ঘোষনায় দেশের সব নাগরিকের সমানাধিকার ঘোষনা করেছে। কিন্তু তারা দেশের সব শ্রেণীর মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে কি? কোন সীমাবদ্ধ ভূ-খন্ডের বৈষম্য বিলোপের দাবী অগ্রগণ্য, না সারা দুনিয়ার এবং তার জাতিগুলির মধ্যে বিস্তারিত বৈষম্য? দুনিয়া তো তার সব সন্তানদের মধ্যে থেকে বৈষম্য উচ্ছেদ করার জন্য অধীর। তার কৃষ্ণ-শ্বেত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্য এবং সভ্যতায় অনগ্রসর, মোট কথা আলণ্ঢাহ্‌র খলীফা নির্বিশেষে সবাইকে একই সারিতে এনে দাঁড় করাতে চায়।

ফরাসী বিপণ্ঢবের স্বাধীনতার ঘোষনা ইতহিাস যাকে পরম সমাদরে বুকে তুলে রেখেছে কিন্তু তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও তুমি যে সাম্যের কথা পাঠ করেছ যা শুধু নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের অধিবাসীদের জন্যই নয় বরং তা বিশ্বকে মুক্তির আহবান শুনিয়েছে ? সে ঘোষনা পুনঃপুনঃ পাঠ করে দেখ সবখানে সে দেশের নাম দেখতে পাবে এবং তাদের সাম্যের উচ্চ হতে উচ্চতর আদর্শ এর অধিক কিছুই দেখতে পাবে না যে, ফরাসী জনসাধারণ একে অপরের সমান হোক।

কিন্ত আলণ্ঢাহর দুনিয়া শুধু ফরাসী এবং ইউরোপীয় জাতিগুলো দ্বারাই অধ্যুষিত নয়। সে তার এ ক্ষতের প্রলেপ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে যেখানে জাতিতে জাতিতে এবং দেশে দেশে বৈষম্য মাথা তুলে রয়েছে?

ইউরোপ তাকে শান্তির পয়গাম দিতে পারে না। ইসলামের হাতেই রয়েছে সে শান্তি আবহায়াত। সে শুধু নিজের দেশ এবং ভূ-খন্ডের অধিবাসীদেরকে পারস্পারিক সাম্যের অধিকারী বলে মনে করেন নাই, বরং তার ঘোষনা ছিল বিশ্বব্যাপী , সার্বজনীন সমানাধিকারের। সে তার ঘোষনায় বলেছে---

হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদেরকে পুর"ষ এবং নারীরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তোমদের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন বংশ গোত্রে পণিত করেছি - তোমাদের মধ্যে তো সম্মানের অধিকারী সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে দ্বীন ও সৎকর্মে শ্রেষ্ঠ।[৪৩]

সাম্যের ঘোষনা শুধু মক্কা এবং আরববাসীর জন্য ছিল না বরং সমগ্র দুনিয়ার জন্যই ছিল। প্রেম, শান্তি ও মুক্তির পয়গাম বিশ্ববাসীর জন্য তা একমাত্র ইসলাম-ই করতে সক্ষম হয়েছে।

আমি তোমাকে সমগ্র মানবমন্ডলীর জ্ন্য সুসংবাদ এবং সর্তকবানী নিয়ে পাঠিয়েছি।[৪৪]

আলণ্ঢাহ্ বিশ্বপালক। তাঁর কাছে কোন দেশ কালের ভেদ বৈষম্য নেই। তার মুক্তি এবং শান্তির পয়গামও এসেছিল সমগ্র বিশ্বের প্রতি শান্তি ও মুক্তির পয়গাম নিয়ে।

[৪৩]আল কুরআন, সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৩

[৪৪]আল কুরআন, সূরা: সাবা, আয়াত: ২৮।